প্র বা স জী ব ন

টো কি ও

তানাবাতা গ্রীষ্ম উৎসব

ব্যস্ত নগরী টোকিও। শত ব্যস্ততার মধ্যেও গ্রীষ্ম উৎসব তানাবাতা সবাইকে আকৃষ্ট করে...

লিখেছেন জাপান থেকে **মোহাম্মদ তানাকা**

জাপানে শীত ঋতুর মতো গ্রীষ্মেও বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এর মধ্যে, তানাবাতা উৎসব হলো একটি উল্লেখযোগ্য গ্রীষ্ম উৎসব। চারদিকে সমুদ্রবেষ্টিত জাপান। মেইজি যুগ থেকে তার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে বিদেশী সভ্যতা, সংস্কৃতি, প্রযুক্তি, শিল্প, বাণিজ্য এবং অর্থনীতির জন্য। কিন্তু তানাবাতা উৎসব দেখে মনে হয় না যে জাপানের জনগণ তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে হারাতে বসেছে। তবে আমাদের দেশের ন্যায় উৎসব পালনের সময় ধর্মকে ইচ্ছাকৃতভাবে গালিগালাজ করা হয় না এ দেশে। এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে প্রতিবছর জুলাই-আগস্ট মাসব্যাপী। সুন্দরী প্রতিযোগিতা– এ প্রতিযোগিতায় কোনো অশ্লীলতার ধারে-কাছে জাপানিরা যায় না। ঐতিহ্যবাহী কিমনো পরে, স্টেজে অংশগ্রহণ করে থাকে জাপানি সুন্দরীরা। ওদোরি বা স্ট্রিট ড্যান্স– হাতে কাগজের তৈরি পাখা, পরনে জাপানি ফতুয়া এবং শর্টস পরিহিত জাপানি যুবক-যুবতীরা ওদোরি বা ড্যান্স করে স্ট্রিট পাস হয়। তবে মুখ তাদের সর্বদা স্নিগ্ধ হাসিতে ভরা থাকে। ব্রাজিলের সাম্বা ড্যান্স– সাম্বায় অংশগ্রহণ করে থাকে, ডিসেন্ট জাপানিরা অর্থাৎ কর্মের অভাবে ব্রাজিলের আমাজন বনাঞ্চল পরিষ্কার করতে গিয়ে যুদ্ধের আগে ও পরে যারা সে দেশের নাগরিক হয়েছিল, তাদেরই পুত্রকন্যারা, অর্ধনগ্ন সাম্বা ড্যান্সে অংশগ্রহণ করে থাকে।

ইমেইয়োশি– চারটি কাঠের দন্ড যা পালকির ন্যায় কাঁধে নিয়ে অগ্রসর হয়। এই দন্ডের ওপরে স্থাপিত মঞ্চের ওপরে ছোট্ট বৌদ্ধ মন্দির এবং তার চারপাশে জাপানি সুন্দরী মেয়েরা শর্টস পরিহিত অবস্থায় বাঁশি বাজাতে থাকে। চমৎকারভাবে ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে তারা।

ডিসকো ড্যান্স– এটি স্ট্রিট পাস হবার সময় অপূর্ব ডেকোরেটেড ট্রাকের ওপরে মেয়েরা স্নিগ্ধ হাসিমাখা অবস্থায় ডিসকো ড্যান্স করে থাকে। এটি সাধারণত তিলোত্তমা টোকিও শহরে শিনজুকু এভিনিউতে হয়ে থাকে। এ ছাড়া সুউচ্চ মই বেয়ে ওপরে উঠে শারীরিক কসরৎ প্রদান, ঢোল বাজানো, স্কুলের ছেলে-মেয়েদের কনসার্টও হয়ে থাকে। জাপানের সর্বত্রই তানাবাতা উৎসবে পুলিশের টাইট সিকিউরিটি থাকে। প্রিজনভ্যান, এ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস স্ট্যান্ডবাই থাকে। তিলোত্তমা টোকিও মহানগরীতে শিনজুকু স্টেশনের পাশের এভিনিউতে শিনজুকু পুলিশ স্টেশনের মার্শাল (ওসি) সাহেব রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ করে দেন তানাবাতা উৎসবের দিনটিতে।

তানাবাতা উৎসবে উদ্দম উচ্ছল জাপানী তরুণী

নি উ ই য় র্ক

পদে পদে বিপদ

জানি না এ দেশটির পরিবর্তন কবে ঘটবে। একটা জাতি বছরের পর বছর একই নিয়মে চলতে পারে না

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রবাসীরা দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে টাকা পাঠিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে বাংলাদেশকে। যখন দেশের নাজুক অবস্থা, রপ্তানি নেই, দাতা দেশ থেকে সাহায্য আসছে না। সাহায্য দিলে খেয়ে ফেলে বড় বড় রুই-কাতলারা। ডেনমার্কের মতো দেশ মন্ত্রী কর্নেল আকবর হোসেনকে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করার পরও সরকার চোখ খোলেনি। কোনো বিচারের ব্যবস্থা করেনি। এজন্য টাকা আবার ফেরত নিয়ে গেলো। দেশের এমনি অবস্থায় প্রবাসীরা হাত বাড়িয়ে বেশি রেমিট্যান্স পাঠিয়ে জাতিকে চরম বিপদের হাত থেকে রক্ষা করলো। প্রবাসীরা দেশকে গড়ার লক্ষ্যে প্রায় ৩৫% বাড়িয়ে পাঠিয়েছে। ০১-০২ অর্থবছরে ১৮১ কোটি ৭৪ লাখ ৮০ হাজার ডলার পাঠিয়েছে। রেকর্ড পরিমাণ টাকা পাঠিয়েছে। অথচ এই প্রবাসীরা নিজের দেশে, নিজের মাটিতে এসে এক রাত শান্তিতে ঘুমাতে পারে না। রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে পারে না। পদে পদে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়।

কৃষক ভাইয়েরা খাদ্যশস্যের বাম্পার ফলন ফলিয়ে দেশের সার্বিক অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রেখেছে। আওয়ামী লীগের শাসন আমলে যখন দাবি করেছিলো আমরা দেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এনেছি। আমি তখন লিখেছিলাম, এসব কৃতিত্বের দাবিদার আমার দেশের সাধারণ মানুষ। খেটে খাওয়া মানুষ তথা কৃষক ভাইয়েরা। প্রবাসীরা যেভাবে দেশে টাকা পাঠাচ্ছে, কৃষক ভাইয়েরা ফসল ফলিয়ে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করছে। এদিকে আমলা-মন্ত্রীরা তথাকথিত শিক্ষিত লোকেরা লুটে খাচ্ছে গোটা দেশটাকে। ওরা যদি সৎভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতো, ভিক্ষুকের জাতি থেকে আমরা অন্তত রেহাই পেতাম।

Shafiuddin Kamal
109-34-115st, Richmond Hill
N.Y- 11420

স্ট ।ক ।হো ।ম

চিকিৎসা ব্যবস্থা

এদেশের ডাক্তাররা আমাদের দেশের ডাক্তারদের মতো নাক উঁচু স্বভাবের নয়। এরা বন্ধু, রসিক এবং পরমাত্মীয়র মতো

সুইডেনে প্রত্যেকটা এলাকায় এক একটি করে কেয়ার সেন্টার আছে। প্রাথমিক অবস্থায় ওখানেই ডাক্তার অথবা নার্সের শরণাপন্ন হতে হয়। গত বছরের হিসাব অনুযায়ী এদেশের ডাক্তারের সংখ্যা ৩২৬৫৬ জন। মাত্র ৯০০ ক্রোনা সুইডিশ মুদ্রা দেয়া হলেই এক বছর পুরো ডাক্তার ও নার্স ফ্রি। ওষুধের জন্য ১৮০০ ক্রোনা হলেই এক বছর ফ্রি। বাচ্চাদের জন্য আছে ০ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে ফ্রি চিকিৎসা। আর যারা বেকার ভাতা পাচ্ছে তাদের জন্য চিকিৎসা এবং জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো সবকিছুই ফ্রি।

ডাক্তারদের সঙ্গে দেখা করতে হলে সে দিনই টেলিফোন করে সময় নিতে হয়। সময় অনুযায়ী কেয়ার সেন্টারের ওয়েটিং রুমে বসলেই ডাক্তার তার রুম থেকে বের হয়ে রোগীর নাম ধরে ডাকতেই শুভেচ্ছার হাত বাড়িয়ে দেন। রোগীকে তার রুমের দরজা খুলে দেন। রোগীকে ভেতরে প্রবেশ করিয়ে নিজে প্রবেশ করেন এবং রোগীতে বসতে দিয়ে নিজে বসেন। এদেশের ডাক্তাররা হন বন্ধুসুলভ ও রসিক। মাঝে মাঝে রোগীর চেয়ারের পায়ের কাছে বসে রোগীর সঙ্গে আলাপ করেন। বিদায়ের বেলায় এগিয়ে দেন দরজা পর্যন্ত। এ যেন এক অন্য জগৎ। এ যেন এক স্নেহ মমতায় ভরা জগৎ। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো যদি কোনো ব্যক্তি হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে মাত্র ৫ মিনিটের মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স এসে হাজির। এবং অত্যাধুনিক হাসপাতালে তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা চলতে তাকে। এতে যদি রোগীর জন্য লাখ লাখ ক্রোনা খরচ হয় তা সম্পূর্ণরূপে ফ্রি।

একবার এক রোগী প্রচন্ড কানের ব্যথা নিয়ে ডাক্তারের কাছে এলেন। ডাক্তার Auto telescope দিয়ে বার বার পরীক্ষা করে হকচকিয়ে গেলেন। রোগী বললো, আমার কি হয়েছে? ডাক্তার উত্তর দিলেন আপনার কানের ভেতর পাখি বাসা বাঁধলো কি করে?

দেশে আমরা অনেকেই পাখির পালক দিয়ে কানের ভেতর ভালোভাবে ঘুরিয়ে পরিষ্কার করি। তখন একটু ঘুম ঘুম আর নেশা নেশা ভাব হয়। আর এই নেশাওয়ালা পালকটি আমরা অতি সযত্নে ম্যানিব্যাগ অথবা বইয়ের পাতায় রেখে দেই। ডাক্তার খুব আগ্রহ ও মনোযোগ দিয়েই শুনলেন সব ঘটনা এবং তিনি একটু অবাক হলেনও বটে।

স্টকহোম শহরটি পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয়

F. Ahmed (নীনা), Jarnbarar vagen 34 7tr,
12761 Skarholmen, Stockholm, Sweden,
Tel- 08-4648531

আ ।ন ।সা ।ন ।সি ।টি

বিশ্বকাপে একদিন

বাংলাদেশীরা খুব বেশি সংখ্যক খেলা দেখার সুযোগ পায়নি। এরকম এক খেলা দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছিল

বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা স্বশরীরে মাঠে যেয়ে দেখার যে অনুভূতি তা কিভাবে প্রকাশ করব ভেবে পাচ্ছি না। দক্ষিণ কোরিয়া পৃথিবীর ১০তম শিল্পোন্নত দেশ, কিভাবে তারা এতো তাড়াতাড়ি উন্নত হল তা কম- বেশি সবারই জানা। শুধু পরিশ্রম আর দেশপ্রেমের কারণে আজ তারা ধনী দেশে পরিণত হয়েছে।

আমি আনসান সিটিতে বাস করি। আনসান থেকে সুওন ১ ঘন্টার রাস্তা। মেট্রো ট্রেন অথবা বাসে করেও যাওয়া যায়। ১২-৩০ মিনিটে আমরা সুওন বিশ্বকাপ মাঠে উপস্থিত হই। আনসান থেকে সুওন যাওয়ার পথে দেখলাম শত শত তোরণ তাজা ফুল দিয়ে অনেক কিছুই লিখে রেখেছে।

খুব সুন্দর শহর সুওন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা জিওংজোর প্রচেষ্টায় এই শহরের জন্ম। ৯,৩০,০০০ লোক বসবাসরত এই শহরটি বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়ার ডিজিটাল টেকনোলজি এবং উদীয়মান শিল্প-সম্ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। ফুটবলের শহরও বলা যেতে পারে সুওনকে। এখানকার স্যাম সাং ব্লু উইংস ১৯৯৮ ও '৯৯ সালে টানা দু'বার জিতেছে কোরিয়ান লীগ শিরোপা। বিশ্বকাপ ফুটবল খেলার মাঠটি ২২৮ উমান ডং, পালডালগু, সুওন সি, গায়ংকিডু অবস্থিত। দর্শক ধারণ ক্ষমতা ৪৩,১৮৮ পার্কিং ২,৭৪৮, স্টেডিয়াম নির্মাণ সম্পন্ন হয় মে ২০০১ সালে। আমরা যখন মাঠের বাইরে অবস্থান করছিলাম তখন দেখতে পেলাম হাজার হাজার মানুষের পদভারে সুওন যেন আনন্দ নগরীতে পরিণত হয়েছে। তখন বেলা ৫টা বাজে। খেলা শুরু হবে রাত ৮-৩০ মিনিটে। বাকি সাড়ে তিন ঘন্টা কিভাবে কাটাবে ভেবে পাচ্ছিলাম না। পেটে ক্ষুধা অনুভব হল। রাস্তা পার হয়ে অপর পাড়ে যেয়ে একটা দোকান থেকে কিছু কলা, আপেল, বিস্কুট, কেক ও কোমল পানীয় কিনে নেই। কিন্তু কোথাও বসে খাওয়ার জো নেই। কারণ সব দোকানের সামনের টেবিলগুলো দখল করে বসে আছে স্পেন এবং আয়ারল্যান্ডের সমর্থকেরা, ওরা বিভিন্ন রঙ বেরঙের পোশাক পরিধান করে কেউ খাচ্ছে, কেউ মনের সুখে নেচে নেচে গান গাইছে।

খাবার দাবার শেষ করে মাঠের চারপাশে ঘুরলাম। কোরিয়ান মেয়েরা নানা রঙে সেজে নানান ধরনের অঙ্গভঙ্গি ও কথা বলে দর্শকদের আনন্দ দিচ্ছিল। অনেক বাংলাদেশী ভাইকে দেখলাম নানা ভঙ্গিমায় বিদেশী ও কোরিয়ানদের সঙ্গে ছবি তুলতে। আমার সাথী সুনীল সাহা তো এ ব্যাপারে এক ধাপ এগিয়ে।

খেলা শেষ হতে হতে রাত ১১টা বেজে গেল। রাস্তায় প্রচন্ড ট্র্যাফিক জ্যাম। একটা বাসে করে সুওন স্টেশনে এসে অনেকক্ষণ বাসের জন্য অপেক্ষা করে আনসার বাস না পেয়ে শেষ পর্যন্ত মেট্রো ট্রেনে চড়ে বাসায় ফিরলাম। রাত তখন ২টা। পরের দিন ঘুম থেকে উঠে আবার জীবনযুদ্ধ শুরু।

S.M. Harun Pasha
A-Jin, Industries co, Ltd
646-7, Sunggok-Dong, Ansan City
Kyungki-D0, South Korea

ব্রু । না । ই

মাছ শিকার

আমাদের দেশীয় ঐতিহ্যবাহী কৈ, শিং, পাবদা, পুঁটি, শোল, বোয়াল, চিতল, পাঙ্গাস ইত্যাদি প্রজাতির মাছ কখনো দেখা বা খাওয়ার সুযোগ খুব একটা হয় না

চীন সাগরের তীরের ছোট দেশ ব্রুনাই। চারদিকে পাহাড়, গাছ-গাছড়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বেষ্টিত এ দেশে আমদানিকৃত মাছ এবং এদেশীয় সামুদ্রিক মাছ ছাড়া তরতাজা আমাদের দেশীয় ঐতিহ্যবাহী কৈ, শিং, পাবদা, পুঁটি, শোল, বোয়াল, চিতল, পাঙ্গাস ইত্যাদি প্রজাতির মাছ কখনো দেখা বা খাওয়ার সুযোগ খুব একটা হয় না। বন্ধুবর ফারুক ভাই প্রায়ই বলতেন, এ দেশের পাহাড়ের ওপর থেকে বয়ে নামা বৃষ্টির পানি যেখানে জমে রাস্তার পাশে সে ক্যানেল বা লেকের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আমাদের দেশীয় এসব প্রজাতির মাছ রয়েছে এবং তা ধরাও সহজ। তাই মাছ ধরার ব্যাপারে সময় করার কথা বলতেন। কোথায় কিভাবে মাছ ধরবো নানা কথা জানতে চাইলে বললেন– মাছ ধরার জাল, দুপুরের লাঞ্চ সবকিছু প্রস্তুত রয়েছে, শুধু পানিতে নামার জন্য দু'জনের দরকার। আমি অহিদ ভাই, সাজু ও নাজিম দেওয়ানকে ম্যানেজ করলাম। কথা হলো আমাকে বাসা থেকে নিয়ে যাবেন। পরদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছে, নির্দিষ্ট সময়ে যখন আসছে, না নিশ্চয় প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে হয়তো তারা আসবেন না। যে কারণে মাছ ধরার ইচ্ছা হারিয়ে ফেললাম। এদের সঙ্গে একরকম যোগাযোগ না করে বাসা থেকে বের হয়ে একটি সাইবার ক্যাফে বসে ওয়েবসাইটে বাংলাদেশের পত্রিকাগুলো দেখছি। সে সময় ফারুক ভাই ও মোশারফ ভাই এসে এক রকম জোরপূর্বক অপ্রত্যাশিতভাবে আমাকে নিয়ে গেলেন। একইভাবে আলম ও সজলকেও নেয়া হলো পথিমধ্য থেকে। দুপুরের লাঞ্চ, ড্রিংকস সবকিছু ফারুক ভাই কিনে নিয়েছেন। মাছ ধরার স্পটে গেলাম। যথারীতি আমাদের দেশীয় কৈ মাছের জাল ও কারেন্ট জাল পাতানো হলো। কোনো মাছ পাওয়া গেল না। অবশেষে বেশ ক'বার স্থান পরিবর্তন করা হলো। খারাপ আবহাওয়ায় আমি নিশ্চিত হয়ে বললাম, এসব থেকে মাছ পাওয়া যাবে না, তাই বাসায় ফিরে যাওয়াটাই শ্রেয়। মোশারফ ভাই তার চিরাচরিত বিপ্লবী স্টাইলে বলে ফেললেন, মাছ না নিয়ে আজ ফিরে যাবো না। প্রয়োজনে কেবি এলাকার বাজার (ব্রুনাইয়ের একটি স্টেট) থেকে কিনে নিয়ে সবার কাছে মুখ রক্ষা করবো।

মির্জা জাকির, mirza_zakir@hotmail.com

না । গো । য়া

মুসলমান মানে সন্ত্রাসী নয়

আল কায়েদার সন্ত্রাসী হামলার কারণে সারা বিশ্বজুড়ে এখন মুসলিম সম্পর্কে বিরূপ ধারণা প্রচলিত

আমরা ছয় জন বাঙালি জাপানের নাগোয়া শহরের উপকণ্ঠে এক কোম্পানিতে কাজ করছি। এখানে কিছু ফিলিপিনো ছাড়া অন্য কোনো বিদেশীর দেখা মেলেনি। তাই মোটামুটি নিরাপদ আছি এই ভেবে আশ্বস্তবোধ করতাম। উল্লেখ্য যে, আমরা জাপানে যত বিদেশী থাকছি এবং কাজ করছি তার সিংহভাগই অবৈধ। আর যে এলাকাতে বেশি বিদেশী থাকে ঐ এলাকাতে ইমিগ্রেশনের নজর বেশি। যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ লেখা তার মূল কথাতে আসছি। আমরা যেখানে কাজ করি তার সন্নিকটেই একটা 'ফ্যামিলি মার্ট' নামে কনভেনিয়েন্স স্টোর– যা ২৪ ঘন্টা খেলো থাকে। একদিন খুব ভোরে মুখোশধারী কিছু লোক ফ্যামিলি মার্টে ঢুকে জোরপূর্বক কিছু ইয়েন ছিনিয়ে নেয়। তাই পুলিশ এসে চারদিকে তল্লাশি শুরু করে। আর বিশেষভাবে খোঁজাখুঁজি করতে থাকে– কোথায় বিদেশী আছে। আমাদের কোম্পানি খুঁজে বের করে এবং আমাদের মালিকের সঙ্গে এ ব্যাপারে খোঁজ খবর নেয়। পরবর্তীতে আমাকে ডেকে বিভিন্ন প্রশ্নে জর্জরিত করতে থাকে। আমি মুসলমান কিনা, নামাজ পড়ি কিনা, মসজিদে যাই কিনা। আশপাশে বাঙালি দোকান আছে কিনা, কি খাই, কোথায় খাই, কোথা থেকে বাজার বা কেনাকাটা করি। কোনো মুসলিম গ্রুপের সঙ্গে সংযোগ আছে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। কথা হলো, ঘটনার সঙ্গে এ সবের কিন্তু কোনো সম্পর্ক নেই, তবুও অবান্তর ও ব্যক্তিগত প্রশ্ন। আসল কথা হল, আমরা মুসলমান, মুসলমান মানেই সন্ত্রাসী বা আল কায়েদার সমর্থক। গত বছরের আমেরিকার ১১ই সেপ্টেম্বর -এর ঘটনার পর থেকে জাপান তথা বিশ্বব্যাপী অমুসলিম প্রধান দেশে এ ধরনের প্রতিক্রিয়া।

Md. Faruk Uzzaman
Aichi-Ken, Ichinomiya, Yamato-cho
Oho-2404, Nagoya, Japan

ওসাকা মসজিদ সংলগ্ন দুই বাঙালি

সু । গা । মো

জাতিসত্তার পুনর্জাগরণ

যদিও আমার অভিজ্ঞতার ভান্ডার শূন্য কিন্তু আবেগ, অনুভূতি ও দেশপ্রেমের কমতি নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই কাঁচা হাতের লেখায় রয়েছে জীবনের পাই পাই সত্যতা ও বিশ্বাসবোধ। বলা চলে ওসব কারণ ও মনের একান্ত আকুতিতেই এই লেখা। যদিও আমার কাজ ও নিত্যদিনের একাডেমিক পাঠ জমে আছে স্তূপাকারে, তবুও এই তাড়া। আজ দেশ ও জাতিসত্তার আবেদনের চেয়ে বড় কিছু এই মুহূর্তে আমার কাছে নেই। সব সময় এমনটি হয় কিনা জানি না। তবে এই মুহূর্তটার কথা বলতে পারছি। আমি জানি আমার দেশমাতা বড় হলে আমিই বড় হবো, আর দেশমাতা ছোট হলে আমি হবো নির্বাসিত দেবতা। আমার অস্থিমজ্জায় তখন অসহায়ত্বের মালা বরণ করবে। তাই সর্বক্ষণ এ ছোট্ট মন পড়ে থাকে সোনার বাংলার সেই ঝাঁউবনে। এখন প্রায়ই মনে হয় সেই অতীত ঐতিহ্যের কথা। যখন পুরো বিশ্বের অনেক মানুষ এ জনপদে এসে জীবিকার জন্য লড়াই করতো। ব্যবসার সূত্র ধরে আসতো আরব বণিক ইউরোপীয় লবণ ব্যবসায়ী (ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পনি) থেকে শুরু করে অনেকেই। ইংল্যান্ডের রানীর ঢাকার মসলিন না হলে যেন চলতোই না। বিশ্ববীর নেপোলিয়নও এ জনপদে এসে আশ্চর্য কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন প্রশংসার ধ্বনি। স্পেনের অধিবাসীরাও আসতো আনন্দচিত্তে। মুগ্ধ মনে জানার আগ্রহ নিয়ে আসতো পর্যটকগণ। বিশ্বখ্যাত পর্যটক হিউএন সাং ও ইবনে বতুতা এসেছিলেন এ জনপদে। সুদূর আফ্রিকা মহাদেশের মানুষগুলোও মরিয়া হয়ে উঠতো এদেশে পা রাখতে। এ কথাগুলো আমার নয়, ইতিহাস থেকেই নেয়া। হয়তো আমরা ইতিহাসের এ ঐতিহ্যমন্ডিত শক্তিকে এখনো ভুলতে পারিনি। এখনো অনেকেই নিশ্চয় গৌরবময় অতীতে পা রাখেন একটু সান্ত্বনা পেতে। আমার কখনো জাপানিদের চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হয় 'তোমরা শোনো, আমরা দরিদ্র নই, আমরা গৌরবময় জাতি। আমাদের ইতিহাস আছে আর আছে গর্ব করার মতো ঐতিহ্য। তাই আমরা সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গ হিমালয়ের চেয়েও কম নই।'

মোঃ আতিকুর রহমান টিপু, সুগামো, জাপান

ব্রুনাই

ভাষা সমস্যা নয়

আসলে ভাষা কোনো বড় সমস্যা নয়। অভিব্যক্তিই অনেক সময় একে অপরের কাছে নিয়ে আসে

মানুষ যে যেই বর্ণ, ধর্ম ও গোত্রের হোক না কেন, পারস্পরিক দেখাশোনা ও একসঙ্গে চলাফেরার কারণে যখন উভয়ের মাঝে একটা আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তখন একে অপরের নিজস্ব ভাষা বলতে না পারলেও সমস্যা হয় না। প্রমাণ পেলাম এক অনুষ্ঠানে চার বন্ধুপত্নীর মাঝে পরিচয় ও পরবর্তীতে অত্যন্ত আন্তরিক সম্পর্ক দেখে।

ক'মাস আগে ব্রুনাইতে এক বন্ধুর প্রথম বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে তার অফিসের সব কর্মকর্তা- কর্মচারীসহ অন্যান্য দেশী-বিদেশী সব বন্ধুদের এক নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানালেন। চার বন্ধুপত্নীও তাদের স্বামীসহ এলেন। এদের তিনজন ভারতীয় ও একজন বাংলাদেশী গৃহবধূ। ভারতীয় তিন গৃহবধূর দু'জন দীর্ঘ সময় ধরে ব্রুনাইতে আছেন। বাংলাদেশী ও ভারতীয় এ দু'গৃহবধূ নতুন ব্রুনাইতে এলেন। এদের চার জনের নিজস্ব ভাষা চার রকম। ভারতীয় তিন জনের একজন উত্তর প্রদেশের হিন্দি ভাষী, আরেকজন কেরালার মালয়লাম ভাষী, অপরজন তামিলনাড়ুর তামিল ভাষী ও বাংলাদেশিনী বাংলা ভাষী। কেউ কিন্তু তাদের নিজস্ব ভাষা ও অল্প অল্প ইংরেজি ছাড়া অন্য কোনো ভাষা ঠিকমতো বলতে ও বুঝতে পারেন না। চারজনই মুসলিম রক্ষণশীল ঘরের মেয়ে। খাওয়া পর্ব শুরু হতে দেরি দেখে আয়োজক বন্ধুটি এদের চারজনকে একত্রে আলাদা স্থানে বসতে দেয় এবং এদের সবাইকে একে অপরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। যথারীতি সাধারণ কুশল বিনিময়ের পর সবাই চুপচাপ বসে থাকলেন। কেউ কিন্তু কারো সঙ্গে কোনো কথা বলছেন না। পুরুষদের অন্য টেবিলগুলোতে যখন আড্ডার ঝড় উঠেছে তখন চার গৃহবধূর মাঝে একরকম নীরবতা লক্ষ্য করলাম। এক পর্যায়ে বাংলাভাষী ভাবি আমাকে ডাকলেন। হিন্দি ভাষী ভাবির কথা কিছু বুঝলেও মালয়লাম ও তামিল ভাষী ভাবির কথা তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। ভাষাগত সমস্যায় এরা চারজন চুপ করে থাকলেও কিছুক্ষণ পর লক্ষ্য করে দেখলাম এদের একজন আরেকজনের সঙ্গে ইংরেজিতে এবং কিছু স্বদেশীয় ভাষার সংমিশ্রণে হাত নেড়ে একে অপরকে বোঝাচ্ছেন। এদের মধ্যেও আড্ডা বেশ জমে উঠেছে লক্ষ্য করলাম। তিন ঘন্টার মাঝে এদের একজন আরেকজনের সঙ্গে বেশ আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

মির্জা জাকির, ব্রুনাই, mirza zakir@hotmail.com

সিওল

দোভাষী

2002 FIFA worlde Cup Korea-Japan কর্তৃক কিছুসংখ্যক দোভাষী স্বেচ্ছাসেবক প্রার্থীকে লিখিত, মৌখিক ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেছে নিয়োগ করেছেন। তাদের মধ্যে আমি বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, থাইল্যান্ড ও মিয়ানমার থেকে আগত দর্শক ও অতিথিবৃন্দের সেবা ও প্রতিনিধির দায়িত্বে নিয়োজিত হয়েছিলাম। জাপানে নিউজ মিডিয়া ও প্রচার মাধ্যমগুলো মূলত জাপানি ভাষার ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় খেলা দেখার জন্য বিদেশ থেকে অসংখ্য দর্শক জাপানে এসে ভিড় জমাচ্ছে। কিন্তু ভাষাগত সমস্যা, কালচার শখ এবং নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হিমশিম খেতে দেখে FIFA কর্তৃপক্ষ তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে টুরিস্ট ইনফরমেশন ও মিডিয়া সেন্টার স্থাপন করেছেন। এসব সেন্টারে ইংরেজি, জাপানি, কোরিয়া, চাইনিজ, স্প্যানিশ, আরবি, ফারসি, জার্মানি ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষাও স্থান পেয়েছে আমার জোরালো আপিল ও দাবির কারণে। FIFA সদস্যভুক্ত দেশগুলোর পতাকা এখানকার স্টেডিয়ামে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গর্বের সঙ্গে শির উঁচু করে উড়ছে। অথচ FIFA থেকে বাংলাদেশ সদস্য পদ হারালে পতাকা নামানোর সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষের কাছে আমি আমার দায়িত্ব থেকে পদত্যাগের লিখিত হুমকি দিলে বাংলাদেশের পতাকার মান সমুন্নত রাখতে বাধ্য করানো হয়।

মোঃ আঃ কুদ্দুস মাখন
সিওল, কোরিয়া

দোভাষীয় ভূমিকায় বাংলাদেশী

প্রবাসীদের প্রতি

প্রবাস জীবন তুলে ধরবে প্রবাসী বাঙালীদের জীবযাপন মনন চেতনার চালচিত্র। প্রবাসীদের সঙ্গে এ সংযোগটা আমরা চাচ্ছি। প্রবাসীদের অনেকেই তথ্যভিত্তিক লেখা লিখছেন। কিন্তু আমরা চাচ্ছি আপনারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখুন। লিখুন পরবাসী জীবনের নানা বৈচিত্র্যময় ও বর্ণময় কাহিনী। লিখুন দূতাবাস সমস্যা। ইমিগ্রেশনের নিয়মকানুন, সন্তানের শিক্ষা, বিদেশী বন্ধু বা বান্ধবীর কথা। ২০০০-এর দেশের পাঠকরা দেশে বসে প্রবাসকে পুরোপুরি জানতে চায়। আপনারা লিখুন। সঙ্গে ছবি দিন। ছবি আপনার লেখাকে সমৃদ্ধ করবে। সম্পূর্ণ ঠিকানা (ফোন ই-মেইলসহ) দিতে ভুলবেন না এমনকি ঠিকানা না ছাপতে চাইলেও।- **বিভাগীয় সম্পাদক**

লেখা পাঠাবার ঠিকানা ঃ

প্রবাস জীবন
The Shaptahik 2000
96/97 New Eskaton Road
Dhaka-1000, Bangladesh.

টোকিও

টাকার গাছ

বিশেষ করে জাপানে যারা থাকে, লোকজন মনে করে কতো টাকা না জানি আয় করে, অথচ কষ্টটা চোখে পড়ে না কারো

আমি প্রচুর টাকা খরচের বিনিময়ে জাপান এসেছি। জাপানে চাকরির মন্দা বাজার এবং নিজস্ব লোক না থাকায় দীর্ঘদিন বেকার থেকে প্রচন্ড কষ্টের মোকাবেলা করতে হয়েছে। প্রবাস জীবনের শুরু থেকে এ পর্যন্ত যতোগুলো চিঠি আমি পেয়েছি এবং যতো বেশি টেলিফোন করেছি ততো বেশি সবার কাছে অপ্রিয় হয়েছি। দুঃখের বিষয় যে, কেউ বলেনি প্রবাসের বাড়িতে তুমি কেমন আছো। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।

শুনতে পাই শুধু হরেক রকম চাওয়া। যেই চাওয়ার কণ্ঠে থাকার কথা নমনীয়তা, সেই চাওয়ার কণ্ঠে থাকে ধমক মেশানো উচ্চারণ। দুঃখের বিষয়, জাপানে এসে যাদেরকে হেল্প করেছি বা করতে যাচ্ছি এদের কেউ আমার প্রয়োজনের সময় হেল্প করেনি বা করতে পারেনি। আর যারা আমাকে হেল্প করেছিলো তাদের কাউকে এখনও আমি হেল্প করতে পারিনি।

এম.এইচ ভুঁইয়া
টোকিও, জাপান